

ভ্যালেনটাইনস ডে ও তারুণ্যের প্রতিবাদবিমুখতা

আ হ সা ন মো হা স্ম দ

গতবছর মধ্য ফেব্রুয়ারীর কথা। সকালে অফিসে যাবার পথে মনে হচ্ছিল পথে যত নারীকে দেখছি সবাই একটু বেশী সুন্দরী। একটু অবাকই লেগেছিল। এমন রোমান্টিক কিছু তো ঘটেনি যে যাকে দেখবো তাকেই সুন্দরী মনে হবে। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য ব্যাপারটি বোঝা গেল। সেদিন ছিল ভ্যালেনটাইনস ডে। নারীরা একটু বেশী সেজেগুজে বেরিয়েছিল।

অফিসে পৌঁছে দেখি সকালে একজন পুরুষ সহকর্মীকে ঘিরে জটলা করছে। গত রাত বারোটা এক মিনিটে একটি অচেনা নম্বর থেকে সে ভ্যালেনটাইন ডে'র মেসেজ পেয়েছে। স্ত্রীকে লুকিয়ে মেসেজটি পড়লেও ফোন করে জানার সাহস হয়নি যে প্রেরণকারী কে। সকাল সকাল অফিসে এসে ফোন করে জানা গেছে, মেসেজ পাঠিয়েছে একজন তরুণী। থাকে কুমিল্লা। সে মেসেজটি ভুল করে পাঠিয়েছে। তবে হাসতে হাসতে জানিয়ে দিয়েছে, 'ভুল করেই ভালোবাসা হয়'। এরকম একটি রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতার জন্য সকলে সহকর্মীটিকে ধরেছে, ঘটনাটি সেলিব্রেট করতে হবে। সে সহজে রাজি না হওয়াতে তাকে উৎসাহিত করতে বললাম, 'আমাকে এ রকম মেসেজ পাঠালে অবশ্যই আমি সেলিব্রেট করতাম।' কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মোবাইলে মেসেজ আসার বিপ শোনা গেল। ভ্যালেনটাইন ডে মেসেজ,

'আমার ভালোবাসা একটি গানের মত, যা চিরকাল বাজতে থাকে
আমার ভালোবাসা একজন বন্দীর মত,
আমি শুধু তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করি।'

নম্বরটি পরিচিত এবং তা একজন সহকর্মীর। মেসেজ পাওয়া দুজনের টাকায় আইসক্রিম আনানো হল। এ পর্ব শেষ হতে সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কাজের সুবাদে প্রত্যেকের অপরের সাথে অনেক কথা বার্তা বলতে হয়। সে আমার টেবিলে এলে দেখলাম, তার দিকে তাকাতে পারছি না। সে কথা বলতে বলতে বার বার গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে। তার কি গলা কাঁপছে? নাকি আইসক্রীম খেয়ে ঠান্ডা লেগেছে? এ ঘটনার পর থেকে যতবার তার দিকে চোখ পড়েছে ততোবার দোটানায় পড়েছি, সে কি সত্যি সত্যিই কৌতুক করে মেসেজটি পাঠালো, নাকি কোন ইঙ্গিত ছিল তাতে?

অফিস থেকে ফেরার পথে নীলক্ষেত যেতে হল। সেখানে একটি বই ফটোকপি করতে দিয়েছিলাম। নিউমার্কেটের বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে যাবার পথে দাড়িয়ে পড়তে হলো। ফুটপাথটিতে সবসময় উপচে পড়া ভিড় থাকে। সে ভিড়কে আরও বাড়িয়ে রাস্তা দখল করে সারি সারি সিডির দোকান বসিয়েছে হকারেরা। কয়েকজন মোটামুটি উচ্চ স্বরেই খন্দের ডাকছে, 'মামা সিডি লাগবে, ভালো কালেকশন আছে, ভ্যালেনটাইনস ডে স্পেশাল।' মনটা ফুরফুরে ছিল বলে, নাকি লেখকের সহজাত কৌতুহলের কারণে জানি না, দাঁড়িয়ে গেলাম। সিডির উপরকার কভারই বলে দিচ্ছে তার ভিতরে কি আছে। নির্জলা পর্ণো সিডির সমাহার। হকার কোন রাখঢাক না করেই তার পণ্যের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। তার সংগ্রহ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিভিন্ন দেশী নর-নারীকে নিয়ে তৈরী নীল সিডি রয়েছে তার স্টলে - ইন্ডিয়ান, জাপানিজ,

আমেরিকান, আফ্রিকান, এমনকি বাংলাদেশীরাও তার তালিকায় রয়েছে। সে বললো, ‘রোকেয়া হলের মেয়েদের ছবি আছে, রাজশাহীর গৃহবধু, বরিশালের গ্রামের মেয়ে..।’ সে যখন বললো, স্যার বেবী সেক্স ও আছে, তখন চোখ বন্ধ করে দ্রুত পালিয়ে আসলাম।

একশ পাওয়ারের লাইট জ্বালিয়ে অতিব্যস্ত ফুটপাথের পাশে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পথচারীদের ডেকে ডেকে পর্ণো সিডি বিক্রয় হচ্ছে, অথচ কেউ কিছু বলছে না, বিষয়টি বেশ বিস্ময়কর লাগলো। আমাদের তৎকালীন করিৎকর্মা সরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাহিনী এর কোন খবর রাখতো না, তাকি বিশ্বাসযোগ্য? নাকি সরকারের উচ্চ মহল থেকে ইচ্ছা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পর্ণো বাজার বসিয়ে রাখা হয়েছিল?

সন্দেহটি আরও কয়েকটি কারণে মনে উদয় হয়েছে। একজন সহকর্মীর ছিলেন যিনি ছিলেন সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব। এ ছাড়া অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে তিনি মহা-পরিচালক ও চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধিকাংশ সফল আমলার মত তিনি এখন রাজনীতি করেন। গত নির্বাচনে ভোট দাড়িয়ে অনেক টাকা খরচ করেছিলেন, যদিও নির্বাচিত হতে পারেননি। দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁর একটি অভিনব ফর্মুলা ছিল। তিনি বলতেন যে পতিতাবৃত্তিকে শুধু পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেই হবে না, বরং তাকে দারিদ্র বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। তাদের জন্য সরকারী উদ্যোগে আলাদা কোর্স চালু করতে হবে যাতে এটিকে তারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। তিনি থাইল্যান্ডের উদাহরণ দিতেন। সেখানে নাকি পর্যটনের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে পতিতারা। একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা তো এক যুগের বেশী সময় ধরে আদিরস বিষয়ক নিয়মিত কলাম ছেপে চলেছে। এখন প্রায় সকল পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে তাদেরকে যৌনকর্মী বলা চালু হয়ে গেছে। যারা নিজেদেরকে সিভিল সোসাইটি বলে মনে করেন, তাদের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে, পতিতাদের পেশাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। দেখা যাচ্ছে, সমাজ ও দেশ চালানোর স্টিয়ারিং যাদের হাতে, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পতিতাবৃত্তি বিস্তারের জন্য হয় সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অথবা এটিকে সমর্থন করে আসছেন।

সেদিন বাসায় ফিরে আসলে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ে দৌড়ে এলো, ‘আবু তোমার জন্য ভ্যালেন্টাইনস ডে’র গিফট।’ একজনের বয়স সাত, অপরজনের দশ। স্কুলে মিস তাদেরকে দিয়ে হার্ট আকিয়েছে। তারা তাতে লিখেছে ‘হ্যাপী ভ্যালেন্টাইনস ডে’। এতোদিন দেখে আসছি, একুশে ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস - ইত্যাদি বিশেষ দিবসগুলোতে বাচ্চারা বিশেষ ছবি যেমন শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি আঁকে। এই সারিতে ভ্যালেন্টাইনস ডে কে একটু বেমানান লাগে বৈকি।

সে কারণেই হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন হঠাৎ করে ভালোবাসা নিয়ে এতো তোড়জোড় শুরু হলো কেন? কেউ কেউ এর সাথে আবার পুঁজিবাদী শোষণের বিস্তার ও তার বিরুদ্ধে তরুণ-তরুণীদের সম্ভাব্য প্রতিবাদ ঠেকানোর যোগসূত্রের কথা বলছেন। যেমন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ লিখেছেন, ‘এ দেশে যাতে পুঁজিবাদবিরোধী কোন অঘটন বা বিপ্লব সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ধনীক শ্রেণী খুবই সচেতন ও সফলও বটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক, কিংবা ইসলামি বিপ্লব, সেটা সার্থকভাবে পথভ্রষ্ট করার সব আয়োজন বাংলাদেশে বেশ ভালোভাবেই আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদীরা জানে, এ দেশের কমউনিস্ট পার্টিগুলো মুখে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজক কথাবার্তা বললেও এরা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত নয়। আর ইসলামপন্থিরা তাদের সজ্ঞশক্তি প্রদর্শনের জন্য হেন সম্মেলন তেন সম্মেলনের আয়োজন করে ওসারে বহরে তারা যে কত বড়, কত বিস্তৃত, তা তাদের

রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রদর্শনের জন্য বিশাল সম্মেলন করেছে। অথচ যারা বিপ্লবের প্রধান উপাদান সে সব তরুণ তরুণী এদের সব আয়োজন ও শক্তি প্রদর্শনের বিপরীত দিকে রওনা হয়েছে। এরা শুধু বিপ্লব বিরোধী নয় বরং ভ্যালেন্টাইন দিবসের মত যুক্তিহীন প্রেমচর্চা ও কামকাতর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সারাদেশে।

আল মাহমুদের এ উপলব্ধি গুরুত্বের দাবী রাখে, কেননা, তিনি সে সকল কবিদের পুরোভাগে রয়েছেন যাদের কবিতার প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম এবং তা কিছুটা আদিম রূপে। এই পরিপূর্ণ বয়সেও তাঁর রোমান্টিকতা যে এতটুকু মলিন হয় নি, তা তাঁর বর্তমানের কবিতা পড়লেও বোঝা যায়। বয়স নয়, রক্ষণশীলতা নয়, বরং প্রেমের পূজারী কবি প্রেমকাতরতা সৃষ্টিকে সন্দেহের চোখে দেখছেন বর্তমানের তারুণ্যকে দেখে। এ কথা তো স্বীকার করতে হবে যে, মেধাবী তারুণ্যের প্রতিবাদই আমাদের ইতিহাস গড়ে দিয়েছে। তাদের জন্যই আমরা নিজেদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি, মাত্র পঁচিশ বছরের মাথায় পুরোপুরি স্বাধীনতা এনেছি এবং বার বার ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে পেরেছি।

কিন্তু প্রতিবাদের সে সব কাহিনী এখন কেবলই ইতিহাস। কোন এক যাদু মন্ত্র বলে সে প্রতিবাদী তারুণ্য যেন কাল ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিনকে দিন দুর্নীতি বিস্তৃত ও প্রকাশ্য হতে হতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বছরের পর বছর আমাদেরকে বিশ্বের সবথেকে দুর্নীতিবাজ জাতির কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সমাজের উপরের তলাটা দুর্নীতিবাজেরা প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। তারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রশাসন তাদের দখলে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতা গড়ে দেয় যে মিডিয়া তার অধিকাংশ তাদেরই মালিকানায। দুর্নীতির কারণে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য। স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত মিলেছে। ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নামমাত্র মূল্যে পাচার হয়ে যাচ্ছে, মোবাইল ফোনের ক্রেজ সৃষ্টি করে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে চলে হচ্ছে এবং বিশ্বায়নের নামে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। অথচ, তারুণ্যকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যাচ্ছে না। শোষণের বিরুদ্ধে শোষণের প্রতিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ নেয় ও বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। কখনও শ্রেণী সংগ্রাম, কখনও জাতীয়তাবাদ, কখনো বা ধর্মকে আকড়ে শোষণের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। আমাদের দেশে শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদ এ প্রতিবাদের কেন্দ্র হতে পারছে না। কিছুটা অবহেলার মধ্যেও ধর্মকে কেন্দ্র করে এ প্রতিবাদের বিকাশের সম্ভাবনা আল মাহমুদের মত অনেকে দেখতে পাচ্ছেন।

হতাশার কথা যে, আমাদের বর্তমান তারুণ্যের প্রধান অংশটি প্রকৃত কোন প্রতিবাদের মধ্যে নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে যাদেরকে রাজপথের লড়াকু সৈনিক নামে দেখা যায় তাদের অধিকাংশই যে প্রতিবাদী নয়, বরং তাদের অনেকেই যে খুবই নিম্ন স্তরের ক্রিমিনাল তা পত্রিকার পাতা খুললেই বোঝা যায়। এমন দিন খুব বেশী যায় না যেদিন ছাত্র নেতাদেরকে ছিনতাই ও রাহাজানির মত অপরাধে হাতে নাতে ধরা পড়ার খবর না বের হয়। শুধু তাই নয় এ সকল নেতাদের কেউ কেউ ধর্ষণের সেধুুরী করেছিল এবং তা সাড়ম্বরে উদযাপনও করা হয়েছিল। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, এটিকে একটি দিবস হিসাবে ঘোষণা করে তা জাকজমক করে এবং সে নেতার আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমে উদযাপনের উদ্যোগ এ পর্যন্ত কেউ নেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় নীল সিডির উন্মুক্ত মেলা, যৌনতাকে স্বীকৃত পেশা ও সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে গ্রহণের পায়তারা এবং সর্বস্তরে কামকাতরতা সৃষ্টিতে সমাজের এলিটদের সক্রিয় প্রচেষ্টা যোগ করলে একটি সরল রেখা তৈরী হয় কিনা এবং সে রেখাটি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সাথে গিয়ে মিলে যায় কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার। এ ধরনের কাম-কাতরতা সৃষ্টি করে প্রতিবাদী তারণ্যকে ভুলিয়ে রাখার ঘটনা নতুন নয়। তেল সমৃদ্ধ নাইজেরিয়াতে এক সময় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তেলের উপর ভাসতো যে দেশ, তা এখন পৃথিবীর দরিদ্রতম, সর্বাধিক দূর্নীতিগ্রস্থ ও এইডসে আক্রান্ত দেশ হিসাবে সকলের কপার পাত্র হয়ে টিকে আছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে অনেকের আগ্রহের সীমা নেই। একটি সমরূপ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে অনেকের ভয়ের অন্ত নেই। তাই যারা দূর্নীতি, শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং একটি সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেন ও দেখান তাদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। চিন্তা করার সময় এসেছে তরুণদেরও। আজও আগামী দিনের বাংলাদেশ তো তাদেরই।